কাজী আবদুল ওদুদের জীবন, জীবনভাবনা ও সংস্কৃতিচিন্তা

মো. জাবেদ ইকবাল*

[**সারসংক্ষেপ :** বিশ-শতকের উপনিবেশিত বাংলার তথা ভারতবর্ষের সংস্কৃতি চিন্তকদের অন্যতম কাজী আবদুল ওদুদ। ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামো ও তীব্র সাম্প্রদায়িক আবহে বসবাস করেও তিনি অন্বেষণ করেছেন শুদ্ধ বাঙালি সংস্কৃতির। তাঁর সংস্কৃতি-চেতনা মূলত সৃষ্টিধর্মী। কর্ম ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে সৃষ্টিপ্রবণতাই তাঁর সংস্কৃতি চিন্তার মূল বৈশিষ্ট্য। সংস্কৃতি-ক্ষেত্রে সমন্বয়বাদিতা, সৌন্দর্যবোধ, সৃষ্টিশীলতা, শ্রেণিহীনতা ও সামাজিক-উৎকর্ষর প্রতি তাঁর প্রবল আস্থা। সংস্কৃতিতে তিনি ধর্মীয়-সম্মোহন ও রাজনৈতিক-তিক্ততা মুক্ত অন্তর্নিহিত সৃষ্টিধর্ম ও মনুষ্যত্বের সন্ধান করেছেন। সংস্কৃতি বিকাশধর্মী না হলে কোনও ভাবেই তার দ্বারা দেশের মনোজীবন ও সমাজজীবনের নব নব সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয় না। তাই ভারতীয় সংস্কৃতির রূপ-রেখা নির্দেশের প্রশ্নে তিনি চিন্তাশ্রয়ী ও সংবেদনশীল। সংস্কৃতির সংমিশ্রণের ক্ষেত্রে কেবল ভারত-ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায় থেকে কিছু উপাদান গ্রহণকে তিনি প্রচ্ছন্ন জাত্যাভিমান বলে মনে করেন। ভারতীয় সংস্কৃতি-চিন্তার ক্ষেত্রে তিনি সৃষ্টিশীলতার সঙ্গে বিনয় ও সত্যানুসন্ধিৎসার একান্ত সংযোগ কামনা করেছেন। সংস্কৃতি বিবেচনায় তিনি সংবেদনশীল ও বুদ্ধিদীপ্ত। জাতীয়-জীবনে সংস্কৃতির তাৎপর্য অনুসন্ধানকল্পে তিনি মনোজীবন, ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবনের উজ্জীবন প্রত্যাশা করেছেন। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতিতে তাঁর মানস-গঠন ও সংস্কৃতিচেতনার স্বরূপ অন্বেষণের প্রয়াস রয়েছে।]

সংকেত শব্দ : জীবনভাবনা, সংস্কৃতিচিন্তা, ঔপনিবেশিক বাংলা, সমন্বয়বাদিতা, মানসগঠন।

এক. ভূমিকা

মানুষ তার দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার প্রয়োজনে বস্তুগত কিংবা অবস্তুগত যা কিছু সৃষ্টি করে বা করেছে তার সবই সংস্কৃতির অন্তর্গত। সংস্কৃতি মানুষের দৈনন্দিন জীবন-যাপনের প্রধান অবলম্বন তথা অস্ত্র। মানব-সভ্যতার ইতিহাসে এমন কোনও মানুষের কিংবা মানব-সমাজের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না, যাদের কোনও সংস্কৃতি নেই কিংবা কখনো কখনও ছিল না। প্রাচীন গুহাবাসী, যাযাবর কিংবা অরণ্যচারী মানুষেরও সংস্কৃতি ছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে বর্তমানে কিংবা অতীতের বিভিন্ন সময়ে আমরা বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থানে প্রাচীন-সভ্যতার যে সকল নিদর্শনাবলি পেয়েছি তা ঐসকল সভ্যতার মানুষের সংস্কৃতিকে প্রতিনিধিত্ব করে। বাঙালি একটি সংকর-জাতি। এই জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি কয়েক হাজার বছরের পুরনো ও মিশ্র। অনার্য জনগোষ্ঠী এই ভূ-খণ্ডের আদি অধিবাসী হলেও বিভিন্ন সময়ে এদেশে আগমন ঘটেছে আর্য, শক, হুন, আরব, তুর্কি, ইরানি, মোঙ্গল, মোগল, তিব্বতি, চীনা ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশের লোকের। ব্যবসা, শাসন কিংবা ধর্ম-প্রচারের উদ্দেশ্যে এদেশে যারা এসেছিল, তাদের খুব কম সংখ্যকই নিজ দেশে ফিরে গিয়েছিল, বেশির ভাগই এদেশে পরিবার গঠন করে থেকে গিয়েছিল। ফলে ঐসকল দেশের সংস্কৃতির কিছু প্রভাব এদেশের সংস্কৃতির ওপর

*সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।

পড়েছিল এবং এক ধরনের সাংস্কৃতিক-সমন্বয় সংঘটিত হয়েছিল। এই দিক বিবেচনায় একথা বলা অত্যুক্তি নয় যে, বাঙালি জাতির মতো বাঙালির সংস্কৃতিও সংকর বা মিশ্র সংস্কৃতি।

বিভিন্ন সময় বাংলার প্রথিতযশা কবি, সাহিত্যিক, সমালোচক, প্রাবন্ধিক, ঐতিহাসিক, সমাজবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানীগণ এদেশের সংস্কৃতি, সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য, সংস্কৃতির উপাদান, সাংস্কৃতিক-সমন্বয় বিষয়ে মূল্যবান প্রবন্ধ রচনা করেছেন। এঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০)। তিনি বিশ-শতকের বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের শীর্ষস্থানীয় একজন মননশীল প্রাবন্ধিক। তিনি পূর্ব-বাংলার ভূমিপুত্র, যদিও শেষ জীবন অতিবাহিত করেছেন পশ্চিমবঙ্গে। তিনি বিশ-শতকের বাংলার ইতিহাসের দুটি আমলকে—ব্রিটিশ, পাকিস্তান—স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন। এই শতকের বাংলার ইতিহাসের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক উত্থান-পতন, স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাংস্কৃতিক রূপ-রূপান্তরের তিনি প্রত্যক্ষদর্শী। বিশ-শতকের বাংলার সংস্কৃতি সম্পর্কে জানার জন্য সংস্কৃতি বিষয়ে তাঁর রচিত প্রবন্ধগুলো অত্যন্ত মূল্যবান। সংস্কৃতি সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলোতে এই বিষয়ে রয়েছে তাঁর স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি। সেখানে সংস্কৃতিকে তিনি সমকালীন দেশীয় তথা ভারতবর্ষীয় সমাজ-বাস্তবতার পটভূমিতে দেখেছেন—যে দেখা ব্যক্তিক ও সার্বিক। সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর এই ভাবনা বাঙালির সংস্কৃতিকে উপলব্ধির জন্য আমাদের নিকট খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

'কাজী আবদুল ওদুদ-এর জীবন, জীবনভাবনা ও সংস্কৃতিচিন্তা' অন্বেষণই বর্তমান প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য এবং সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতিতে আমরা অগ্রসর হবো। সেজন্য আমরা প্রথমে প্রাবন্ধিকের মানস-গঠন সম্পর্কে আলোচনা করবো। গবেষণার সুবিধার্থে বর্তমান গবেষণাকর্মের পরিধি কাজী আবদুল ওদুদ-এর *শাশ্বতবঙ্গ* (২০১৪) গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধসমূহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে তবে বিষয়-বিশ্লেষণের প্রয়োজনে আমরা প্রাবন্ধিকের অপরাপর রচনাসমূহকেও আলোচনায় অর্ন্তভুক্ত করবো।

দুই. কাজী আবদুল ওদুদ-এর মানস-গঠন

কাজী আবদুল ওদুদ অবিভক্ত বাংলার ফরিদপুর জেলার পাংশা থানার অন্তর্গত বাগমারা গ্রামের এক বনেদি মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কাজী সগীর উদ্দিন ওরফে সগীর কাজী এবং পিতামহের নাম কাজী মোহাম্মদ ইয়াসিন মতান্তরে কাজী ইয়াসিন আলী। পাংশা থানা বর্তমানে রাজবাড়ি জেলার অন্তর্গত। রাজবাড়ির পার্শ্ববর্তী জেলা কুষ্টিয়া। এই কুষ্টিয়া জেলার পদ্মা তীরবর্তী জগন্নাথপুর গ্রামে মাতুলালয়ে ২৬ এপ্রিল ১৮৯৪ রোজ শুক্রবার তাঁর জন্ম। পদ্মার ভাঙনের কারণে তাঁর মামা-বাড়ি বাগমারা থেকে প্রায় সাড়ে তিন মাইল দূরবর্তী হোগলা গ্রামে স্থানান্তরিত হয়। হোগলা গ্রামটি বর্তমানে শিলাইদহ থেকে আটাশ মাইল পূর্বে অবস্থিত। বাগমারা-হোগলা-জগন্নাথপুর পদ্মা-তীরবর্তী গ্রাম হওয়ায় প্রমত্ত পদ্মা কাজী আবদুল ওদুদের শৈশব-সঙ্গী; তাঁর ভাষায় 'প্রবলসঙ্গী'। পদ্মার বিস্তার ও প্রমত্ততা অলক্ষেই সঞ্চারিত হয়েছিল তাঁর মানসচেতনায়। তাঁর পূর্ব পুরুষেরা এক সময় পদ্মার অপর তীরবর্তী পাবনা জেলার কসবা নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর পারিবারিক পদবি ছিল 'কাজী'। শৈশবে তাঁর ডাকনাম ছিল 'ফিতু কাজী' বা 'ফতুমিয়া'। তাঁর বংশ-পরিচয় উল্লেখ করতে গিয়ে কাজী মোতাহার হোসেন বলেছেন—"এঁরা যে কাজী বংশের লোক, আর সৈয়দ বলে কখনও দাবীও করেননি তাতে কোনও সন্দেহ নাই।" (মোতাহার, ১৩৮১ : ২)

কাজী আবদুল ওদুদের পিতামহ ইয়াসিন কাজী বিত্তবান ও বিদ্বান না হলেও বিজ্ঞব্যক্তি ছিলেন। "তাঁর জ্ঞানের উৎস ছিল পারিপার্শ্বিক জীবন, পুঁথি নয়" (সিরাজুল, ২০১৩ : ১৩)। তিনি পরিশ্রমী, সচ্চরিত্রবান ও নির্বিরোধ লোক ছিলেন; নিজের কাজে ব্যস্ত থাকতেন; অন্যের

ব্যাপারে নাক গলাতেন না। কাজী আবদুল ওদুদের পিতামহী ছিলেন অসাধারণ ফারসি জানা মৌলবির মেয়ে। তিনি যতোটা না ধর্মভীরু তার চেয়ে বেশি বুদ্ধিমতী, কর্মকুশলা ও কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন। ফলে এটা অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, ওদুদের পরিবারে বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা সঞ্চারিত হয়েছিল তাঁর দাদির শোণিত থেকে। কাজী আবদুল ওদুদের পিতা সগীর কাজী গ্রামে সামান্য কিছু লেখাপড়া করে পরে মুর্শিদাবাদে গমন করেন এবং সেখানে তালিবপুরের জমিদারবাড়ির আশ্রয়ে থেকে মাইনর ক্লাস পর্যন্ত অধ্যয়ন শেষে চাকরির সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছিলেন। এসময় কলকাতার ইস্ট-বেঙ্গল রেলওয়েতে তার একটি ছোট-খাটো চাকরি হয়। চাকরি লাভের পূর্বেই সগীর কাজীর বিয়ে হয়েছিল বিত্তবান পাঁচু মোল্লার ছোট মেয়ের সঙ্গে। সগীর কাজী পরবর্তীতে ইস্টবেঙ্গল রেলওয়েতে স্টেশন-মাস্টারের পদ লাভ করেছিলেন এবং দর্শনা-সোদপুর-হাওড়া প্রভৃতি স্টেশনের দায়িত্ব পালন করেন। হাওড়ার স্টেশন-মাস্টার থাকাকালে স্টেশন-কোয়ার্টারেই ১৯২২ সালের দিকে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি একজন আত্মীয়–বৎসল, মহৎ-হৃদয় ব্যক্তি ছিলেন, আভিজাত্যের একটি স্বাভাবিক পরিচয় তার চরিত্রে বর্তমান ছিল, আবেগ-প্রাবল্য তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, বেশি লেখাপড়া তিনি করতে পারেননি, কিন্তু তার স্মৃতিশক্তি ছিল বিস্ময়কর। কাজী মোতাহার হোসেন এর মতে, "তিনি বড় মিশুক ও রসিক লোক ছিলেন। গ্রামে এলেই সবার বাড়িতে এসে দেখা করতেন আর অনেক গল্পগুজব করতেন। ওঁর কথাবার্তার ঢং ছিল অতিশয় স্পষ্ট আর মতামত অতিশয় দৃঢ় ও সুনির্দিষ্ট। গ্রামের সবাই তাঁকে ভালোবাসত, তিনিও কারো শত্রু ছিলেন না" (মোতাহার, ১৩৮১ : ২)। কাজী আবদুল ওদুদ-এর দৃষ্টিতে, তাঁর পিতা ছিলেন একান্ত খেয়ালি, কিন্তু অতি স্নেহময় মনের একজন মানুষ। আত্মীয়-স্বজনদের দুঃখ তিনি আদৌ সহ্য করতে পারতেন না; আত্মীয় পরিজনদের দান করতে ছিলেন মুক্ত-হস্ত। তার আত্মসম্মানবোধ ছিল অসাধারণ। তিনি সাহেবদের সঙ্গে মারামারি করে রেলওয়েতে চাকরি ছেড়েছেন বহুবার। দরিদ্র আত্মীয়দের সঙ্গে প্রাণ খুলে মিশলেও তিনি বড়লোক আত্মীয়দের গ্রাহ্য করতেন না। তিনি গোঁড়া মানুষ ছিলেন না। কাজী আবদুল ওদুদের জননী ছিলেন ধীর-স্থির প্রকৃতির, প্রখর বুদ্ধি-বিবেচনা-সম্পন্ন, অতিশয় দৃঢ় চরিত্রের কর্তৃত্ব অভিলাষী নারী। তার বুদ্ধিমত্তা ও কর্মদক্ষতা দেখে ওদুদের দাদি তাকে বিয়ের অল্প-কাল পরেই সংসারের কর্তৃত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন।

কাজী আবদুল ওদুদের মাতামহ পাঁচু মোল্লা ছিলেন সম্পদশালী, বিচক্ষণ, বিদ্বান, প্রতিপত্তিশালী ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন জবরদস্ত লোক। তৎকালে যখন দেশের জনসাধারণ বিশেষত মুসলমান সমাজে ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন হয়নি, তখন তিনি আপন সন্তানদেরকে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলেছিলেন। তাঁর বড় ছেলে আসহাবউদ্দীন পিরোজপুরে বড় দারোগা হন, মেজো ছেলে খবীরউদ্দীন (বি.এ) শিক্ষা বিভাগের সহকারী ইন্সপেক্টর ছিলেন এবং ছোট ছেলে নাজিরউদ্দীন ঢাকা-নরসিংদী-রূপগঞ্জ থানার দারোগা-বড়দারোগার দায়িত্ব পালন শেষে কলকাতার বেঙ্গল পুলিশের ইন্সপেক্টর হয়েছিলেন। তার ওপর ছিল ওদুদের লেখাপড়ার ভার। কনিষ্ঠ মাতুলের সঙ্গে থেকে তিনি বিভিন্ন জায়গায় লেখাপড়া করেন এবং বাংলাদেশের নানা অঞ্চলের লোকদের সঙ্গে মিশবার সুযোগ লাভ করেন। নাজিমউদ্দীন বিলাসী কিন্তু ধর্মভীরু লোক ছিলেন।

ব্যক্তির মানসগঠনে শৈশব-কৈশোরের পরিবার-পরিবেশ-প্রকৃতি প্রধান ভিত্তিভূমির কাজ করে, পরবর্তীতে এর সঙ্গে শিক্ষা-অভিজ্ঞতা-সাধনা যোগ হয়ে ব্যক্তিকে পূর্ণ পরিচয়ে বিকশিত করে তোলে; ব্যক্তি তখন পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্বে পরিণত হতে পারে। কাজী আবদুল ওদুদও তাই হয়েছিলেন। তাঁর শৈশব কাটে প্রধানত পিতৃগৃহে, কৈশোর পদ্মার ধারে মাতুলালয়ে। অতএব

তাঁর শৈশব-কৈশোরের মানসগঠনে পিতা-মাতার পরিবার, গ্রাম বাংলার মানুষ-প্রকৃতি-পরিবেশ, নদী, বিস্তীর্ণ মাঠ ইত্যাদি প্রভাব ফেলেছিল। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি যে পরিচয়ে সুদৃঢ় হয়ে ওঠেন তার প্রধান নিয়ামক শিক্ষা, সাধনা, অভিজ্ঞতা ও সাহচর্য।

কাজী আবদুল ওদুদের বাল্য-শিক্ষা পিতৃগৃহ ও মাতুলালয়েই সম্পন্ন হয়। পাঁচ/ছয় বছর বয়সে নিজেদের বাড়িতেই তিনি অক্ষর-জ্ঞান লাভ করেন এবং স্কুলে ভর্তি হওয়ার পূর্বে বাড়িতেই English First Book পাঠ করেন। নয় বছর বয়সে তিনি মাতুলালয়ে গিয়ে নিকটস্থ জগন্নাথপুর এম. ই স্কুলে ভর্তি হন। সেখানে তিনি নিম্ন-প্রাইমারি পরীক্ষা পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। এ সময় তিনি মাইকেল মধুসূদন দত্তের *মেঘনাদবধ কাব্যের* সঙ্গে পরিচিত হন। পরবর্তীকালে তাঁর ছোট মামা নাজিরউদ্দীন দারোগার চাকরি নিয়ে ঢাকায় স্থানান্তরিত হলে ভালো লেখাপড়ার জন্যে তাঁকেও সঙ্গে নেন এবং ঢাকার ইম্পেরিয়াল সেমিনারি স্কুলে ভর্তি করে দেন। এর চার মাস পর নাজিরউদ্দীন নরসিংদী থানায় বদলি হলে তাঁকেও ঢাকা ছেড়ে নরসিংদীর শাটিরপাড়া হাই স্কুলে গিয়ে চতুর্থ শ্রেণিতে ভর্তি হতে হয়। শাটির পাড়া হাই স্কুলে তিনি ১৯০৬ থেকে ১৯০৮ পর্যন্ত মোট তিন বছর লেখাপড়া করেন এবং সেখান থেকে ষষ্ঠ শ্রেণি পাস করে ১৯০৯ সালে পাবনা ইনস্টিটিউশনে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হন। সেখানে তিনি এক বছর পড়াশোনা করেন। এরপর নাজিরউদ্দীন বড় দারোগার চাকরি নিয়ে রূপগঞ্জ থানায় বদলি হলে ওদুদ ১৯১০-১১ সালে পাবনা ছেড়ে রূপগঞ্জের নিকটবর্তী মূড়াপাড়া স্কুলে অষ্টম ও নবম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করেন। এখানে অষ্টম শ্রেণিতে অধ্যয়নকালে তিনি অক্ষয়কুমার দত্তের *বাহ্য বস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ নির্ণয়* গ্রন্থটি পড়ার সুযোগ লাভ করেন। সেটি পড়ে তাঁর মনে এমনই প্রতিক্রিয়া জাগে যে, প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি আমিষ খাদ্য বর্জন করেছিলেন। ফলে তাঁর শরীর বেশ কৃশ হয়ে পড়ে এবং পরীক্ষায় তিনি আশানুরূপ ফল লাভ করতে পারেননি। তিনি ১৯১২ সালে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে দশম শ্রেণিতে ভর্তি হন এবং সেখান থেকে ১৯১৩ সালে কৃতিত্বের সঙ্গে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন। তিনি বরাবরই ভালো ছাত্র ছিলেন, স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষায় প্রায়ই প্রথম হতেন। দশম শ্রেণির টেস্ট পরীক্ষায়ও তিনি অতিরিক্ত বিষয় সংস্কৃতসহ সকল বিষয়ে প্রথম স্থান লাভ করেছিলেন। বাংলায় কম নম্বর পাওয়ায় সমাপনী পরীক্ষায় তিনি আশানুরূপ ফল লাভ করতে না পারলেও দশ টাকার একটি ডিস্ট্রিক্ট স্কলারশিপ পেয়েছিলেন। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে অধ্যয়নের পূর্ব পর্যন্ত তাঁর ছাত্রজীবন প্রধানত বৃহত্তর ঢাকা জেলায় বিভিন্ন গ্রামের স্কুলেই কেটেছে।

কলেজিয়েট স্কুলে অধ্যয়ন-কালকেই কাজী আবদুল ওদুদ-এর নাগরিকবোধ ও মননশীলতা জন্মানোর কাল হিসেবে গণ্য করা যায়। এই সময় তিনি রচনা লিখে পুরস্কারও পেয়েছিলেন। দশ-বারো বৎসর বয়সে তিনি স্বদেশি আন্দোলন দেখেন। ঐ বয়সেই মেধাবী হিন্দু ছেলেদের সঙ্গে স্বাদেশিকতা, ইউরোপীয় ও ভারতীয় সভ্যতার তারতম্য ইত্যাদি বিষয়ে আলাপ করতেন। ম্যাট্রিক পাস করার পর তিনি ছোট মামার পরামর্শে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তেন যান। ১৯১৩ সালে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে আই. এ ক্লাসে ভর্তি হন। এই সময় তিনি রবীন্দ্রনাথের *গীতাঞ্জলি* পাঠ করে মুগ্ধ হয়ে রবীন্দ্রানুরাগী বনে যান। তাঁর মানস-গঠনে গ্যেটে ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রভাব সম্পর্কে অন্নদাশঙ্কর রায় বলেছেন, "গ্যেটে কাজী সাহেবের যৌবনকে নিবিষ্ট রেখেছিলেন। আর রবীন্দ্রনাথ তাঁর সারা জীবনকে" (অন্নদাশঙ্কর, অষ্টম খণ্ড, ১৪২৪ : ২৭)। এছাড়াও তিনি প্রমথ চৌধুরীর মাসিক *সবুজপত্রর* গ্রাহক হন এবং *সবুজপত্রে* প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'বিবেচনা ও অবিবেচনা' প্রবন্ধটি পড়ে গভীরভাবে আলোড়িত হন।

১৯১৫ সালে কাজী আবদুল ওদুদ প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে আই. এ পাস করেন। ১৯১৩-১৯১৫ এই তিন বছর তিনি কলকাতার সরকারি বেকার (Baker) হোস্টেলে ছিলেন। এই

হোস্টেলে অবস্থানকালে তিন শান্তিপুরের কবি মোজাম্মেল হকের জ্যেষ্ঠ পুত্র মোহাম্মদ আফজাল-উল-হক-এর সাথে মিলে হোস্টেল থেকে একটি হাতে-লেখা পত্রিকাও বের করেছিলেন। এই সময়েই বাংলা সাহিত্যে তাঁর হাতেখড়ি হয়। সাহিত্যের প্রতি বিশেষত বাঙলা সাহিত্যের প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল।

১৯১৭ সালে কাজী আবদুল ওদুদ প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি.এ পাস করেন। এসময় সংস্কৃত তাঁর পাঠ্যবিষয় হলেও আরবি-ফারসি-উর্দু'কে তিনি অ্যাকাডেমিক বিষয় হিসেবে নেননি, ব্যক্তিগতভাবে শিখেছিলেন। বি. এ পাসের পর তিনি বেকার হোস্টেল ত্যাগ করেন। এ সময় তাঁর মামা নাজিরউদ্দীন বেঙ্গল পুলিশের ইন্সপেক্টর হয়ে কলকাতা গমন করলে ওদুদ তাঁর বাসায় থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ অধ্যয়ন শুরু করেন এবং ১৯১৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পলিটিক্যাল ইকোনমিতে এম. এ ডিগ্রি লাভ করেন। নাজিরউদ্দীন পরবর্তীকালে কৃষ্ণনগরে বদলি হলে ওদুদ 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র অফিসে গিয়ে ওঠেন। সেখানে তিনি বন্ধুবর আফজল-উল হকের সঙ্গে বাস করতে থাকেন। তরুণ কবি কাজী নজরুল ইসলামও (১৮৯৯-১৯৭৬) তখন সেখানে গিয়ে উঠেছিলেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজ বি. এ অধ্যয়নকালে ১৩২২ সালের ৭ ফাল্গুন ছোট মামা নাজিরউদ্দীনের আগ্রহে স্বীয় বড় মামা আসহাবউদ্দীনের জ্যেষ্ঠ কন্যা জমিলা খাতুনের সঙ্গে কাজী আবদুল ওদুদ বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হন। সুন্দরী, চৌকস ও গৃহ-শিক্ষায় শিক্ষিত স্ত্রীর অপূর্ব স্নেহময় প্রকৃতি ও নিঃশেষে আত্মদানের ক্ষমতায় তিনি প্রেম-প্রীতির ক্ষেত্রে নূতন দীক্ষা লাভ করেন। কৃষ্ণনগরে অবস্থানকালে তিনি কিছুদিন আইন বিষয়ে পড়াশোনা শুরু করলেও পারিবারিক কারণে তা শেষ করতে পারেননি। স্ত্রীর কঠিন অসুখের খবর শুনে তিনি গ্রামের বাড়ি ফিরতে বাধ্য হন। বি. এ অধ্যয়নকালে দেশের জন্য কাজ করবেন বলে তিনি চাকরি না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু সে সিদ্ধান্তে অটল থাকতে পারেননি। ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে (বর্তমান ঢাকা কলেজ) প্রভাষক পদে তিনি চাকরি নিয়েছিলেন। এ বিষয়ে অন্নদাশঙ্কর রায় বলেছেন :

> ওদুদ ছিলেন সুভাষচন্দ্র ও দিলীপ কুমারের সতীর্থ। প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়বার সময় থেকেই তিন বন্ধুর সংকল্প চাকরি করবেন না, দেশের কাজ করবেন। সেই অনুসারে ওদুদের চাকরি করার কথা নয়। কিন্তু [...] বিয়ের পর অসুস্থ পত্নীর মুখ চেয়ে চাকরি নিতে হলো ওদুদকে। ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে [...] লেকচারার পদে নিযুক্ত হয়ে কাজী বললেন তাঁর স্ত্রীকে, "তোমার শরীর একটু ভালো দেখলেই চাকরিতে ইস্তফা দেব।"
>
> স্ত্রীর স্বাস্থ্যের জন্য চাকরি নেওয়া। স্বাস্থ্যও কোনোদিন ভালো হলো না। চাকরিও কোনো ১ দিন ছাড়া হলো না। যথাকালে পেনশন নিয়ে কাজী সাহেব কলকাতায় বসবাস করলেন। কমিউট করে সে-টাকায় বাড়ীটাকে বাড়ালেন। কিন্তু যাঁর জন্য এসব করা তিনি একদিন দেহত্যাগ করলেন। তারপর থেকে কাজী সাহেবও বাড়ী ছেড়ে আর কোথাও যাবেন না গেলেও বেশীদিন থাকবেন না। অন্য ঘরে শোবেন না, অন্য খাটে শোবেন না। জানিনে মনে মনে বলতেন কিনা, "এই খাটেতেই মৃত্যু ওঁর, এই খাটেতেই মরি।" (অন্নদাশঙ্কর, অষ্টম খণ্ড, ১৪২৪ : ৩২)

১৯৫৫ সালের ২ জানুয়ারি শুক্রবার কলকাতার তারক দত্ত রোডের বাড়িতেই জমিলা খাতুন মৃত্যুবরণ করেন। তাঁদের সংসারে চার ছেলে ও তিন মেয়ের আগমন ঘটে, কিন্তু অকালেই দুই ছেলে ও দুই মেয়ে মারা যায়। একমাত্র জীবিত কন্যা বেগম জেবুন্নিসা বুলি'কে তিনি রবীন্দ্রনাথের পরামর্শে শান্তিনিকেতনে ভর্তি করিয়েছিলেন। তাঁর সংসার জীবন সুখময় ছিল, যদিও সন্তানের মৃত্যু এবং স্ত্রীর অসুস্থতার কারণে তিনি মাঝে-মধ্যে বিষাদগ্রস্ত হয়েছেন। তিনি সহজেই দুঃখ-বিপত্তি কাটিয়ে আপন কর্তব্য-কর্মে সুদৃঢ় হতে পারতেন। এ ক্ষেত্রে স্ত্রীও তাঁকে

অনুপ্রেরণা ও সাহস জোগাতেন। বিড়াল পালনের শখ ছিল তাঁর। বাড়িতে আধ-ডজনের মতো বিড়াল পালতেন তিনি। অর্থকষ্টে থাকলেও ভাড়াটেদের কাছ থেকে পাওনা আদায় করতে তাঁর অনিচ্ছা ছিল। তাঁর মৃত্যুর দুই যুগ পরেও তাঁর তারক দত্ত রোডের বাড়িতে এমন সব ভাড়াটিয়া ও আশ্রিতরা বসবাস করছে যারা ওদুদের রক্ত সম্পর্কীয় নন কিন্তু ওদুদের কাছ থেকে পিতৃতুল্য স্নেহ ভালোবাসা পেয়েছেন।

কাজী আবদুল ওদুদের কর্মজীবন শুরু হয় ১৯১৯ সালে এম. এ পাস করার পর। এ সময় কিছুদিন তিনি কলকাতার একটি মুসলিম সওদাগরি অফিসে ঘোরাফেরা করেছিলেন। তিনি ১৯২০ সালে ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে বাংলার প্রভাষক পদে যোগদান করেন। এ পদের জন্য বেশ কয়েকজন আবেদন করলেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের তৎকালীন অধ্যক্ষ ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন (১৮৬৬-১৯৩৯) প্রার্থীদের মধ্য থেকে তাঁকে নির্বাচন করেন (অন্নদাশঙ্কর, অষ্টম খণ্ড, ১৪২৪ : ৩৩)। পলিটিক্যাল ইকোনমিতে এম. এ পাস করেও বাংলা সাহিত্যের প্রভাষক পদে নিয়োগ পাওয়ার পশ্চাতের প্রধান কারণ ছিল তাঁর সাহিত্যিক পরিচিতি। ছাত্রজীবনেই তাঁর গল্পগ্রন্থ *মীর-পরিবার* (১৩২৫) ও উপন্যাস *নদীবক্ষে* (১৩২৬) প্রকাশিত হয়েছিল এবং তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮) ও শশাঙ্কমোহন সেনের (১৮৭২-১৯২৮) প্রশংসা লাভ করেছিল। ১৩২৩ চৈত্র সংখ্যা *ভারতবর্ষে* তাঁর 'বিরাজ বৌ' শীর্ষক রচনা ছাপা হয়। ১৩২৫ পৌষ সংখ্যা *প্রবাসী*তে বের হয় তাঁর 'মুসলমান সাহিত্যিক' এবং ১৩২৭ বৈশাখ সংখ্যা *মোসলেম ভারত*-এ 'সাহিত্যিকের সাধনা' শীর্ষক প্রবন্ধ। 'সাহিত্যিকের সাধনা'র সপ্রশংস সমালোচনা করেছিলেন প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬) তাঁর *সবুজপত্র* পত্রিকায়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপনায় তাঁর নিযুক্তির মূলে ছিল এই সব রচনা। তবে অন্য মতে জানা যায় যে, তখন ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের এই পদে কোনো মুসলমানকে নিয়োগ করা হবে বলে সরকারি সিদ্ধান্ত ছিল। কিন্তু তখন পর্যন্ত সারা প্রদেশে কোনো মুসলমান ছাত্র বাংলায় এম. এ পাস করেনি। তাই তাঁর সাহিত্যিক পরিচিতি জেনে ড. দীনেশচন্দ্র সেন তাঁকে উক্ত পদের জন্য সুপারিশ করেছিলেন।

কলেজে যোগদানের এক বছরের মধ্যেই কাজী আবদুল ওদুদ শিক্ষক হিসেবে সুপরিচিতি লাভে সক্ষম হন। তাঁর বলার ভঙ্গি ছিল অসাধারণ, সাহিত্য বিচারেও ছিল অত্যন্ত সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি। শিক্ষকতার পাশাপাশি তাঁর সাহিত্যচর্চাও অব্যাহত ছিল এবং এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সমাজ-ভাবনা। সংগীতচর্চায়ও তিনি কিছুটা উৎসাহী হয়েছিলেন। তিনি কয়েকটা ওস্তাদিগান শিখেছিলেন। তবে তাঁর মুখে সব গানই রবীন্দ্রসঙ্গীতের মত শুনাত। তবে তার গলা ছিল দরাজ এবং পদ্যের লয় বোধও ছিল অনন্য। তিনি সেতার বাজাতে পারতেন। কলেজে তাঁর শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯২২-১৯৭১) অন্যতম। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ তাঁর চিন্তাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। (ভূঁইয়া ইকবাল, ১৯৯১ : ১৫৪)

কাজী আবদুল ওদুদ ১৯৪০ সাল পর্যন্ত টানা বিশ বছর ঢাকা ইন্টামিডিয়েট কলেজে অধ্যাপনা করেন। এসময় তিনি আপন সুকুমারবৃত্তির-চর্চার মাধ্যমে নিজেকে যেমন বিকশিত করে তুলেছিলেন, তেমনি পারিপার্শ্বিক সমাজের, বিশেষত আপন সম্প্রদায়ের মানুষদের বিকাশ-সাধনের চেষ্টায়ও অত্যন্ত সক্রিয় হয়েছিলেন। তাঁর ও অধ্যাপক আবুল হুসেনের (১৮৯৬-১৯৩৮) নেতৃত্বে এবং আবদুল কাদিরের সক্রিয় সহযোগিতায় ১৯২৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকার 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ', যার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল বাংলার পশ্চাৎপদ মুসলমান সমাজের সামনে নবজাগরণের আদর্শকে তুলে ধরে জীবনকে জাগিয়ে তোলা এবং 'বুদ্ধির মুক্তি'-মন্ত্রকে তুলে ধরা (সিরাজুল, ২০০৬ : ১২২)। বর্তমান মুসলমান সমাজের জীবন ও

চিন্তাধারার গতির পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে দার্শনিক জেমসের আদর্শে সমাজের নবজীবন (renovation) লাভই তাঁদের কাম্য ছিল। তাই তাঁরা মুসলিমদের জীবনের প্রতিটি স্তরে সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তার গলদগুলো আবিষ্কারের চেষ্টায় সক্রিয় হয়ে ওঠেন এবং সে-সব ত্রুটি সংশোধনের মাধ্যমে জড়তাগ্রস্ত মুসলমান সমাজকে আত্মপ্রত্যয়দীপ্ত ও গতিশীল করে তুলতে চেয়েছিলেন। এ লক্ষ্যে তাঁরা দেশের উচ্চশিক্ষিত চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গকে একত্রিত করে তাঁদের মুক্তচিন্তা ও স্বাধীন মতামত মাতৃভাষার মাধ্যমে বাঙালি মুসলমান সমাজে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সভা-সম্মেলন, মুখপত্র প্রকাশ ও বাদ-প্রতিবাদ করেছেন। কাজী আবদুল ওদুদ ছিলেন বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের ভাবযোগী এবং মুসলিম সাহিত্য সমাজের সকল কর্মকাণ্ডের প্রাণ-পুরুষ। নানা প্রতিকূলতা, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি ও রক্ষণশীল সমাজের বিরোধিতা সত্ত্বেও মুসলিম সাহিত্য-সমাজ ১৯২৬ থেকে ১৯৩৬ পর্যন্ত সক্রিয় ছিল। ঢাকার নবাব-বাড়ির পক্ষ থেকে মুসলিম হলে সাহিত্য-সমাজের সভানুষ্ঠান নিষিদ্ধ হলে তথাকথিত ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগে তিনি ও আবুল হুসেন নিগৃহীত হন। এসকল কারণে তিনি আর ঢাকায় থাকতে চাননি। চাকরির প্রতি মোহহীন হওয়া সত্ত্বেও এ সময় তিনি কলকাতায় বদলি হবার জন্যে বেশ উদগ্রীব হয়ে ওঠেন।

১৯৪০ সালে বাংলা সরকার প্রাদেশিক টেক্স্ট বুক কমিটি সেক্রেটারি ও 'রীডার'-এর পদ সৃষ্টি করলে কাজী আবদুল ওদুদ উক্ত পদে নিযুক্তি পেয়ে ঐ বছরের মে মাসে কলকাতায় গভর্নমেন্ট সেক্রেটারিয়েটে গিয়ে ওঠেন। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হলে জাপানি বোমা হামলার ভয়ে বাংলা সরকারের টেক্স্ট বুক কমিটির অফিস রাজশাহীতে নেওয়া হলে তিনি রাজশাহীতে স্থানান্তরিত হন। রাজশাহী কলেজ প্রাঙ্গণেই ছিল তাঁর অফিস। যুদ্ধ শেষে ১৯৪৫ সালে সাময়িকভাবে স্থানান্তরিত অফিসসমূহ আবার কলকাতা ফিরে গেলে তিনিও কলকাতায় ফিরে আসেন (সিরাজুল, ২০১৩ : ২২)। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৫ আগস্ট থেকে উক্ত পদের সঙ্গে Registrar of Publication-এর পদ যুক্ত করে দেন এবং সে পদে তিনি নিযুক্ত থাকেন। প্রায় পাঁচ বছর উক্ত পদে কর্মরত থাকার পর ১৯৫১ সালের জুলাই মাসে তিনি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন (সিরাজুল, ২০১৩ : ২২)। কলকাতার তারক দত্ত রোডে বাড়ি নির্মাণ করে সেখানেই তিনি স্থায়ীভাবে থেকে যান।

ধর্মনিরপেক্ষ (Secular) মতাদর্শে বিশ্বাসী কাজী আবদুল ওদুদ ছিলেন পাকিস্তান-বিরোধী (অন্নদাশঙ্কর, অষ্টম খণ্ড, ১৪২৪ : ২৯)। দ্বি-জাতিতত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে নবগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রে নানা সুযোগ-সম্মান লাভের অবকাশ থাকা সত্ত্বেও আদর্শগত কারণে তিনি ঢাকা তথা পাকিস্তানে ফিরে আসেননি। তাঁর ইচ্ছা ছিল শেষ বয়সে হযরত মোহাম্মদ (স.), গ্যেটে ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্বন্ধে তিনটি গ্রন্থ রচনা করা। লেখার উপকরণ কলকাতায় যত সহজলভ্য হবে, ঢাকায় তা হবে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্তির প্রলোভন দেখিয়ে তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের মন্ত্রী ফজলুর রহমান তাঁকে ঢাকায় আসার আমন্ত্রণ জানালেও তিনি রাজি হননি (সিরাজুল, ২০১৩ : ২২)। কেননা স্বীয় প্রজ্ঞা দ্বারা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন সাহিত্য-সাধনা ও স্বাধীন মত প্রকাশের ক্ষেত্রে পাকিস্তানের মতো রাষ্ট্র তাঁর জন্যে নিরাপদ স্থান নয়।

কাজী আবদুল ওদুদ সম্যকভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে, পশ্চাৎপদ, জড়তাগ্রস্থ মুসলিম সমাজের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশে পত্র-পত্রিকার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই তিনি মুসলিম সাহিত্য-সমাজের লেখকবৃন্দের চিন্তাধারা বাঙালি মুসলমান সমাজে তুলে ধরার জন্য বেশ কিছু পত্র-পত্রিকার আশ্রয় নিয়েছিলেন। এগুলোর মধ্যে *সওগাত* (১৩২৫, নবপর্যায় আষাঢ় ১৩৩৩)সহ *তরুণপত্র* (বৈশাখ ১৩৩২), *যুগের আলো* (মাঘ ১৩৩২), *অভিযান* (ভাদ্র

১৩৩৩), *শিখা* (চৈত্র ১৩৩৩), *নওরোজ* (আষাঢ় ১৩৩৪), *জাগরণ* (বৈশাখ ১৩৩৫), *সঞ্চয়* (১৩৩৫), *জয়তী* (বৈশাখ ১৩৩৭), *বুলবুল* (বৈশাখ ১৩৪০), *ছায়াবীথি* (কার্তিক, ১৩৪০) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য (সিরাজুল, ২০১৩ : ২৮)। তিনি এই সকল পত্র-পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করতেন। তাঁর অধিকাংশ লেখা উল্লিখিত পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই সব পত্র-পত্রিকার কোনও কোনওটির প্রকাশের পেছনেও তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। মুসলিম সাহিত্য-সমাজের মুখপত্র *অভিযান* ও *শিখা* প্রকাশের ক্ষেত্রে তাঁর প্রত্যক্ষ ভূমিকা ও সক্রিয় প্রচেষ্টা নিযুক্ত থাকত। যদিও এগুলোর সম্পাদক হিসেবে তাঁর নাম মুদ্রিত হয়নি, তবুও এ-সব প্রকাশের ক্ষেত্রে তাঁর সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা ছিল অকৃপণ। ১৩৬১ সালের বৈশাখে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় *সংকল্প* নামের মাসিকপত্র। ঢাকার মুসলিম সাহিত্য-সমাজ এর 'বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন' এর মতো পশ্চিমবঙ্গে অনুরূপ একটি ভাবান্দোলন ও লেখক-গোষ্ঠী সৃষ্টির উদ্দেশ্যই ছিল তাঁর *সংকল্প* প্রকাশের মূলে। তাঁর সম্পাদনায় *সংকল্প* ১৩৬১ বঙ্গাব্দের বৈশাখ থেকে চৈত্র পর্যন্ত অনিয়মিত সাতটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। গ্রাহক-স্বল্পতা ও অর্থাভাবের কারণে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। নুরুল আমিনের মতে—

> মূলত ওদুদের এই সব পত্র-পত্রিকা প্রকাশনা ও সম্পাদনা কর্ম নিছক সাংবাদিকতা কিংবা নিছক সাহিত্য-প্রীতি ছিল না, বরং এর মধ্য দিয়ে তিনি তার জীবনচেতনার বাণীকে সম্প্রসারিত করতে চেয়েছিলেন। আর তার জীবনচেতনার প্রধান বাণীই তো হলো উদার মানবিকতা ও লোকহিত বিচারবুদ্ধির জয়গান করা। তাই তার পত্র-পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ হলেও জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নানাভাবে তার সেই প্রচার অব্যাহত ছিল। (নুরুল, ২০০৮ : ৩১)

কাজী আবদুল ওদুদ বাঙলার একজন শ্রেষ্ঠ মুসলিম ভাবুক ও চিন্তাবিদ হিসেবে সমকালের পণ্ডিতদের কাছে স্বীকৃত হন। তিনি ছিলেন তাঁর সময়কালের একজন প্রতাপান্বিত পুরুষ। বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের নেতা হিসেবে তিনি সাহিত্যচর্চায় প্রাধান্য দিয়েছেন যুক্তি ও মুক্তবুদ্ধিকে। একজন উদারনৈতিক যুক্তিবাদী ও মননশীল লেখক হিসেবে তিনি সমগ্র বাঙালি সমাজে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। জার্মান সাহিত্যিক গ্যেটের ভাবশিষ্য ছিলেন তিনি। মানবাত্মার বিকাশ ও সম্ভাবনায় ছিল তাঁর অপরিসীম বিশ্বাস। এই বিকাশের প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধেই তিনি বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন। তাঁর সেই কাজ রামমোহন রায়-এর (১৭৭২-১৮৩৩) কাজের সঙ্গে তুলনীয়। জীবদ্দশায় ১৯৭০ সালে তিনি 'শিশিরকুমার পুরস্কার' লাভ করেন।

অবসরকালীন দুই দশকে কাজী আবদুল ওদুদ হযরত মুহাম্মদ (স.), গ্যেটে ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'কে নিয়ে গ্রন্থ রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন, অধিকন্তু এই সময়ে তিনি দুখণ্ডে *পবিত্র কোরআনের* অনুবাদ করেন; 'বাংলার জাগরণ' এবং 'শরৎচন্দ্র ও তাঁরপর' শীর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন (অন্নদাশঙ্কর, অষ্টম খণ্ড, ১৪২৪ : ২৬-২৭)। তাঁর *ব্যবহারিক শব্দকোষ* শীর্ষক অভিধানও এ সময়ে প্রকাশিত হয়। এভাবে ১৯৬৬ সালের মধ্যে তিনি তাঁর সাহিত্যিক-কৃত্য অনেকটা সম্পাদন করেন। কিন্তু তাঁর স্বাস্থ্য ক্রমশ ভেঙে পড়তে থাকে। ১৯৬৪ সালে দেশব্যাপী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হলে তিনি বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। এসময় তিনি পারকিনসন্স রোগে আক্রান্ত হলে তাঁর ডান হাতে কাঁপুনি দেখা দেয় এবং ক্রমশ তিনি অথর্ব হয়ে পড়েন। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গের শান্তি ও শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং দুই বাংলার ভিতরকার যোগাযোগ ভেঙে পড়লে তিনি আরও বেশি বিচলিত হন। ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হলে তিনি অতিশয় শঙ্কিত হয়ে পড়েন। ১৯৬৭ সালের পর থেকে তিনি শারীরিকভাবে আরও বেশি দুর্বল হয়ে পড়েন। একা চলাফেরা করতে তাঁর অসুবিধা হত। দু'একবার পড়েও গিয়েছিলেন। পরবর্তীতে তাঁর রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পেলে ১৯ মে ১৯৭০ মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

কাজী আবদুল ওদুদ ছিলেন নিরহঙ্কার ও অমায়িক ব্যক্তি। সারল্য তাঁর চরিত্র্যিক বৈশিষ্ট্য। পিতার সহজ-সুন্দর আভিজাত্য তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে একবার আলাপ-পরিচয় করলে যে কেউ মুগ্ধ হয়েছেন। ভদ্র-মনোভাব ও ভদ্র-ব্যবহার তাঁকে সহজেই অন্যের নিকট প্রিয় করে তুলত। পিতার নিকট থেকে তিনি আরও একটি গুণের অধিকারী হয়েছিলেন, সেটি তাঁর অসামান্য স্মৃতিশক্তি। অপর দিকে মায়ের বুদ্ধি ও বিবেচনাবোধও তিনি লাভ করেছিলেন। বুদ্ধির প্রখরতা তাঁকে চালিত করেছে সংস্কারমুক্ত স্বাধীন ব্যক্তিত্ববোধের দিকে; আর বিবেচনাবোধ তাঁকে চারিত্রিকভাবে সুষ্ঠু-সামঞ্জস্য করে গড়ে তুলতে সহায়তা করেছে। এ দুটি সম্পদই তাঁর চরিত্র ও প্রকৃতির প্রধান গৌরববস্তু। বিচার-বিবেচনা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে নিজের সম্পর্কে হিসেব করে দেখার মতো বুদ্ধি ছিল বলেই প্রতিষ্ঠা অর্জনের পরও তাঁর অন্তরে বিন্দুমাত্র অহঙ্কার স্থান পায়নি। তবে আচার-ব্যবহার প্রভৃতিতে সুষ্ঠুতার দিকে স্বাভাবিক রুচিবোধের কারণে তাঁকে আপাতদৃষ্টিতে দাম্ভিক বলে মনে হতে পারত, কিন্তু তাঁর মুখের হাসিটি একবার দেখলেই সেই ভাব দূর হয়ে যেত, তখন আসল মানুষটিকে চিনে নিতে আর ভুল হতো না। সৈয়দ আলী আহসান লিখেছেন :

> কাজী আবদুল ওদুদ ছিলেন তাঁর সময়কালের একজন প্রতাপান্বিত পুরুষ। প্রতাপের কোনও প্রকাশ তাঁর মধ্যে ছিলো না অর্থাৎ তাঁর কোনও অহমিকা ছিলো না কিন্তু তাঁর কথা বলায়, যুক্তির প্রতিষ্ঠায় এবং প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হবার পদ্ধতিতে একটি বলিষ্ঠ প্রতাপ সহজেই লক্ষ্যগোচর হতো। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বিনয়ী ও নিরহংকার ছিলেন কিন্তু সামাজিক এবং ধর্মীয় কর্মে ও চিন্তায় সর্বমুহূর্তেই তাঁর কোনও না কোনও বক্তব্য থাকতো। এ-বক্তব্যকে তিনি প্রকাশ করেছেন অকুতোভয়ে। তাঁর বিশ্বাসের একটি সুদৃঢ় ভিত্তি ছিলো তাই তিনি কখনও বিচলিত হতেন না। কোনও ক্ষেত্রেই তিনি নিজের অধিকারকে ছাড়তেন না অর্থাৎ কোনও বিষয়ে তাঁর কোনও সুদৃঢ় মতামত থাকলে সে মতামতকে তিনি প্রতিষ্ঠা করতেনই। (উদ্ধৃত, নুরুল, ২০০৮ : ৩৬-৩৭)

কাজী আবদুল ওদুদ প্রখর আত্মমর্যাদাবোধ ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ ছিলেন। সে সঙ্গে তাঁর ছিল নির্লোভ ও নির্মোহ দৃষ্টি। ছাত্র অবস্থা থেকেই তিনি ছিলেন ভাবুক ও গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। এজন্য বন্ধুরা তাঁকে একটু আলাদাভাবে দেখতেন। এমনকি কাজী নজরুল ইসলামও যখন তাঁর সান্নিধ্যে ছিলেন তখন তাঁর এই স্বাতন্ত্র্যটুকু মেনে নিতেন। তিনি ছিলেন সদালাপী, আনন্দময়, প্রিয়-দর্শন যুবা। আপন গাম্ভীর্যের মধ্যেও তিনি সেই বৈশিষ্ট্যটুকু রক্ষা করতেন। ছাত্র, যুবা, সাহিত্যিক, বন্ধু-বান্ধব যারাই তাঁর সান্নিধ্য পেতে চাইত তাদের সঙ্গে তিনি আন্তরিক আলাপে মগ্ন হতেন এবং লেখা ছাড়াও অনেকটা সেভাবেও তিনি তাঁর মতামত প্রচার করতেন। মতামত প্রচারের প্রয়োজনে চিঠিপত্রের সাহায্যও নিতেন। তাঁর কাছে মানবতাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠতম আদর্শ। সকল প্রকার কুসংস্কার ও জড়তাবোধের সঙ্গে জড়িত সনাতন প্রথার বিরোধী ছিলেন তিনি। তিনি চেয়েছিলেন দেশের মানুষ সংস্কারের বেড়াজাল থেকে মুক্ত হয়ে যুক্তি ও বিচার বিবেচনার মাধ্যমে সত্যকে আবিষ্কার করতে সক্ষম হোক। তাঁর কাছে মানুষের চারিত্রিক মাধুর্য ও জ্ঞানের সাধনাই ছিল বড়। তিনি এমনি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন যে, একটি সরকারি কলেজের শিক্ষক হয়েও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও শিক্ষকদের সাথে মেশার সময় কখনও হীনমন্যতায় ভোগেননি। দেশভাগের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ পদ প্রদানের প্রস্তাবকেও তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তরুণ লেখকদের তিনি নানাভাবে উৎসাহিত করতেন; তাদের লেখা নিয়ে আলোচনা করতেন; আগ্রহ সহকারে তাদের লেখা-পাঠ শুনতেন; পরামর্শ দিতেন; এমনকি তাদের বইও ছেপে দিতেন। তিনি নিজে একজন মননশীল সাহিত্যসেবী হলেও তাঁর রসবোধ ও সাহিত্যনিষ্ঠা এতই অকপট ছিল যে, গ্রামীণ পালাগান কিংবা লোকগীতিকায় লুকায়িত সাহিত্য উপাদানের উচ্চ-স্বীকৃতি দানেও তিনি অকৃপণ ছিলেন।

কাজী আবদুল ওদুদ ছিলেন অকপট, স্বাধীনচেতা ও স্পষ্টভাষী মানুষ। তাঁর উপলব্ধিতে যা সত্য বলে প্রতিভাত হতো তাকেই তিনি অকপটে প্রকাশ করতেন। উপরন্তুদের মনরক্ষা করার কপটতা তাঁর ছিল না। চিত্তের ঔদার্যে ও চিন্তার সততায় তিনি এতই শক্তিমান ছিলেন যে সহজে অন্যকে প্রভাবিত করতে পারতেন। তাঁর জীবনটাও ছিল মার্জিত, পরিশীলিত আর পরিমিতিবোধে সংযত ও সংহত। কখনও তাঁর সহজাত সম্মান ও মর্যাদাবোধকে তিনি ক্ষুণ্ন হতে দেননি। সামান্য আলাপচারিতায় তিনি নিজ স্বপ্ন ও আদর্শকে অন্যের মধ্যে সঞ্চারিত করতে পারতেন, আর জাগ্রত করতে পারতেন শ্রদ্ধা ও ভালবাসা। এ তাঁর এক দুর্লভ গুণ। যারা তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন তারা সকলেই তাঁর ব্যক্তিত্বের স্পর্শে মুগ্ধ হয়েছেন, শ্রদ্ধা করেছেন তাঁর পৌরুষকে। (অরবিন্দ, ১৩৭৭ : ৭)

কাজী আবদুল ওদুদ ছিলেন ধর্মপ্রাণ ও বিশ্বাসী পুরুষ (অরবিন্দ, ১৩৭৭ : ৭)। ইসলামের শাশ্বত বাণী এবং হজরত মুহাম্মদ মোস্তফার (স.) এর ভক্ত ও অনুরাগী ছিলেন তিনি। আজীবন তিনি মুসলমানদের কথা চিন্তা করেছেন এবং তাদের সংশোধন ও অগ্রযাত্রার কথা ভেবে লেখনী ধারণ করেছেন। মুসলিমদের এক অংশ তাঁকে বরাবরই ভুল বুঝেছে এবং নজরুলের মতো তাঁকে 'কাফের' বলতেও দ্বিধা করেনি কিন্তু অন্নদাশঙ্কর রায়-এর দৃষ্টিতে , "তিনি ছিলেন একজন জীবনদার্শনিক" (অন্নদাশঙ্কর, অষ্টম খণ্ড, ১৪২৪ : ২৬)। এদিক থেকে স্যার সৈয়দ আহমদের (১৮১৭-১৮৯৮) সঙ্গে তাঁর কাকতালীয় মিল রয়েছে। তিনি সর্বক্ষণ মুসলমানদের কথাই ভাবতেন। তিনি চাইতেন যারা তাঁর গোত্রভুক্ত মানুষ, তাঁরা যথার্থভাবে মানুষ হোক এবং রসুলের আদর্শ অনুসরণ করে আপন জীবনকে মহিমান্বিত করুক। তিনি ধর্মান্ধতা বা সাম্প্রদায়িকতার ঘোর বিরোধী ছিলেন। মানুষকে তিনি মনুষ্যত্বের মাপকাঠিতে বিচার করতেন। হিন্দু-মুসলমান তাঁর কাছে সমান মর্যাদা পেত। মুক্ত পরিবেশে তাঁর মানস গঠিত হয়েছিল বলে একথা তিনি সহজেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, বুদ্ধির মুক্তি ব্যতিরেকে বাঙালি মুসলমান সমাজ প্রগতির পথে অগ্রসর হতে পারবে না এবং বাঙালি মুসলমান সমাজ পেছনে পড়ে থাকলে সামগ্রিকভাবে বাঙালি জাতির মুক্তির পথও অবরুদ্ধ হয়ে যাবে। তাই সারা-জীবন তিনি শাশ্বত বঙ্গের সাধনা করে গেছেন, সমৃদ্ধি কামনা করেছেন শাশ্বত বাঙালির (সিরাজুল, ২০১৩ : ২৮)। তিনি সব সময়ই উচ্চ ভাব ও গুরুগম্ভীর অধ্যয়ন নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। মাঝে মধ্যে কাজী মোতাহার হোসেনের সঙ্গে দাবা খেলতেন। তিনি কিছুটা ভোজন বিলাসীও ছিলেন। তিনি যে একজন প্রখর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ ছিলেন তার প্রমাণ পেতে কষ্ট হয় না। 'ঋষিকল্প মানুষ' বলতে যা বুঝায়, তিনি ছিলেন তাই। ভাষার ব্যবহারে, পোশাকে তিনি যেমন ভদ্র, বিনয়ী, রুচিশীল, তেমনি সুরসিক। বিশ্বের সব দেশের মানুষ আর প্রকৃতি ছিল তাঁর আপন; কোনো সম্প্রদায়ের নীচতা-হীনতাকে তিনি আদৌ প্রশ্রয় দিতেন না।

তিন. কাজী আবদুল ওদুদ-এর সংস্কৃতি-ভাবনার স্বরূপ

কাজী আবদুল ওদুদ-এর সংস্কৃতি-ভাবনার আধার তাঁর রচিত 'সংস্কৃতির কথা' প্রবন্ধ। প্রবন্ধটি ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। বিশ-শতকের চল্লিশের দশকে ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষে শাসক-শ্রেণির বিভাজন-নীতির ফলে যখন ভারতবর্ষের দুই প্রধান জনগোষ্ঠীর মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিরোধ তীব্র, দাঙ্গায় হিন্দু-মুসলমান দুই পক্ষের অনেকের জীবন-বিপন্ন, ধর্মের ওপর ভিত্তি করে স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানের দাবিতে মুসলিমরা আন্দোলনরত তখন বাংলার মুসলমানের সংস্কৃতি সম্পর্কে কাজী আবদুল ওদুদ যা বলেছেন, তারই সুসংবদ্ধ রূপ আলোচ্যমান প্রবন্ধটি। প্রবন্ধটিতে প্রাবন্ধিক কাজী আবদুল ওদুদ বাংলার মুসলমানের সংস্কৃতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে অষ্টাদশ শতকের ইউরোপীয় প্রেক্ষাপটে সংস্কৃতি শব্দটির উৎপত্তি, উনিশ শতকের ভারতের শিক্ষিত শ্রেণির সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি, সংস্কৃতির বিশ্বজনীন তত্ত্বের ও

ব্যক্তিতান্ত্রিক মতবাদের ত্রুটি, ভারতবর্ষে মুসলিমদের আবির্ভাবের ইতিহাস ও এই অঞ্চলের হিন্দু-মুসলমান, আর্য-সেমেটিক সংস্কৃতির নানাদিক, সংস্কৃতি-চর্চায় এদেশের শিক্ষিত শ্রেণির কূর্মবৃত্তি অবলম্বনমূলক মনোভাব, ভারতবর্ষে সাংস্কৃতিক বিরোধ ও এ থেকে উত্তরণের উপায় এবং অসার্থক সংস্কৃতি-চিন্তার স্তর থেকে সার্থক সংস্কৃতি-চিন্তার স্তরে উপনীত হওয়ার উপায় নির্দেশ করেছেন।

উনিশ শতকে রামমোহন রায় ও বিশ শতকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরসহ বাংলার অপরাপর মনীষাগণ নানা ধর্মের সমন্বয়ে সমন্বয়ী সংস্কৃতির কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু তখন বাঙালি হিন্দু ও মুসলমান, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উদ্দীপনায় রিলিজিয়াস রিফর্মেশনের চেয়ে রিলিজিয়াস রিভাইভালিজমে বিভ্রান্ত ছিল। ধর্মের আলোয় আলোকিত হওয়ার চেয়ে শাস্ত্রের অ্যালকোহল পান করে মাতাল হওয়ার দিকেই মানুষের ঝোঁক ছিল বেশি। প্রবন্ধের শুরুতেই তাই শ্রেণি বা ধর্মভিত্তিক কোনো বিভাজন রেখা না টেনে কাজী আবদুল ওদুদ সংস্কৃতি বিবেচনায় মানবস্বভাবের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন—

> মনে হয় মানুষ স্বভাবত পৌত্তলিক; কোনো বিশেষ প্রতিমা বিশেষ তত্ত্ব বিশেষ আচার বা বিশেষ ধরন-ধারণ—এ না হলে যেন তার চলতে চায় না। আর এরই সঙ্গে সঙ্গে সে পরিবর্তনপ্রিয়তার প্রতিমা তত্ত্ব আচার বা ধরন-ধারণ ক্রমাগত বদলায়। (ওদুদ, ২০১৪ : ৮৮)

আঠারো শতকে ইউরোপে নানামাত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হয়। ফরাসি বিপ্লবের অমোঘ বাণী 'সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা' মানুষের অধিকার, মানুষের মনুষ্যত্বকে জাগ্রত করে। শিল্পবিপ্লব ধর্ম-সংস্কারের মাধ্যমে পুঁজির বিকাশকে ত্বরান্বিত করে। ভ্রাতৃত্ববোধ, সমতা ও স্বাধীনতাই ইউরোপীয় সংস্কৃতির মানবিক ও গণতান্ত্রিক ঔদার্যকে সংরক্ষণ করেছিল। ইউরোপের রেনেসাঁস ও রিফরমেশনের পিছনে অর্থনৈতিক বিপ্লব তথা পুঁজির বিকাশের ভূমিকা মুখ্য। তবে খ্রিষ্টধর্মের অভ্যন্তরীণ রিফরমেশনের মাধ্যমে ধর্ম গির্জা থেকে বাজারে প্রতিস্থাপিত হয়, আবির্ভাব ঘটে প্রোটেস্ট্যান্টদের। উনিশ শতকে শিল্প বিপ্লবের পর নূতন নূতন অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়। কাজী আবদুল ওদুদ মনে করেন, অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে ভাব-বিপ্লব, অর্থনৈতিক বিপ্লব ও রাষ্ট্রিক বিপ্লবের প্রভাবে উনিশ শতকে সেখানে সংস্কৃতি কথাটা প্রবল হয়। সেখানে তখন ধর্মের স্থান দখল করে সংস্কৃতি। সে সময় সংস্কৃতি বলতে বুঝা হত খ্রিষ্টান-অখ্রিষ্টান সমস্ত রকমের জ্ঞান ও উৎকর্ষের মধ্যকার এক বিশেষ সমন্বয়কে। প্রথমে ব্যক্তিতান্ত্রিকতা তথা ব্যক্তিত্বের উৎকর্ষ এর প্রধান প্রবণতা হিসেবে দেখা দিলেও ইউরোপে যেহেতু ঐকালে সঙ্ঘবদ্ধ জীবন অনেক বেশি সক্রিয় ছিল ফলে অচিরেই এই ব্যক্তিতান্ত্রিকতা মোড় নেয় সামাজিকতার দিকে। তবে, কাজী আবদুল ওদুদ-এর দৃষ্টিতে, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ব্যক্তিতান্ত্রিকতা দুর্বল-চিন্তা। কারণ, মানুষ সামাজিক জীব। যে ব্যক্তিগত বা পারিবারিক উৎকর্ষের সামাজিক মূল্য কম তা যতই সুদর্শনই হোক শেষ পর্যন্ত তা সর্বসাধারণের নিকট অদ্ভুত বৈ আর কিছু নয়। ফলে স্বাভাবিকভাবেই এক যুগে যার সামাজিক মূল্য কম অন্য যুগে তার সামাজিক মূল্য বেশি হতে পারে। তাঁর ভাষায়—

> সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ব্যক্তিতান্ত্রিক যে দুর্বল চিন্তা তা বোঝা কঠিন নয়। [...] অবশ্য একথা সত্য যে, এক যুগে যার সামাজিক মূল্য কম অন্য যুগে তার সামাজিক মূল্য বেশি হতে পারে। কিন্তু এমন কতকগুলো ব্যাপার আছে, স্বভাবতই যার সামাজিক মূল্য কম। মানুষের ইতিহাস বিচিত্র-বিচিত্র ভাবের মধ্যে দিয়ে তার অভিব্যক্তি হয়েছে ও হচ্ছে। তাই যে-সব চিন্তা প্রকৃতপক্ষে জনহিতকর নয়, বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীর বা দলের চেতন বা অবচেতন স্বার্থবোধের অনুকূল মাত্র, অথবা ক্ষণিক খেয়াল, সে-সবের দিকেও মাঝে মাঝে নেতৃস্থানীয়দের প্রবণতা জন্মেছে। (ওদুদ, ২০১৪ : ৮৯)

কাজী আবদুল ওদুদ-এর মতে, সুন্দরের সাধনা-ই সংস্কৃতি। বিশেষভাবে সত্যাশ্রয়ী-জগৎ ও জীবনের সঙ্গে এর রয়েছে গভীর যোগ এবং এর গতি সার্থকতা লাভের দিকে। পাশাপাশি, সংস্কৃতির মূলকথা হওয়া উচিত সামাজিক উৎকর্ষ লাভ। সমাজ বলতে যেহেতু একদিকে বিশ্বমানব-সমাজ ও বিশেষ দেশগত বা রাষ্ট্রগত সমাজ, তাই সংস্কৃতি প্রত্যয়টি বিশ্বসামাজিক হয়েও রাষ্ট্রিক। এমতাবস্থায় যে সংস্কৃতি জগতের অনেকের মনে অনুরণন জাগায় না এবং যার রাষ্ট্রিক সার্থকতা কম, তা স্বাভাবিকভাবেই মূল্যহীন। তাঁর দৃষ্টিতে—

> সেকালের ধর্মের মতো একালের সংস্কৃতিরও মূল কথা হওয়া চাই সামাজিক উৎকর্ষ লাভ। আর যেহেতু সমাজের অর্থ একদিকে বিশ্বমানব সমাজ অন্যদিকে বিশেষ বিশেষ দেশগত বা রাষ্ট্রগত সমাজ, সেজন্যে সংস্কৃতিও মূলত বিশ্বসামাজিক ও রাষ্ট্রিক। [...] যে চিন্তা জগতের অনেকের মনে অনুরণন জাগায় না এবং যার রাষ্ট্রিক সার্থকতা কম, তা বাস্তবিকই স্বল্পমূল্য বা মূল্যহীন-হোক না তা অন্যভাবে যত অসাধারণ। (ওদুদ, ২০১৪ : ৮৯)

তাঁর বিবেচনায়, সংস্কৃতি সম্পর্কে বিশ্বজনীনতার কথা একালে বাস্তবিকই অচল। কারণ, চিন্তা চিরদিনই বিশ্বজনীন এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি পাওয়াই বর্তমানকালে চিন্তার-বিশ্বজনীনতা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রতিনিয়ত নতুন নতুন চিন্তা-ধারা মানুষের মনে স্থান পাচ্ছে, পুরাতন চিন্তার প্রভাব মন থেকে দূর হয়ে যাচ্ছে। সনাতন চিন্তা-ধারা আর মানুষের মনকে বন্দি করে রাখতে পারছে না। ধর্মের দোহায় দিয়েও রক্ষণশীল দেশগুলো প্রাচীন চিন্তা-ধারাকে ধরে রাখতে পারছে না। এর কারণ, "সংস্কৃতি কেবল মানুষের সৌখিন পোষাক-পরিচ্ছদ নয়, তা তার জীবন যুদ্ধের অস্ত্র, আর অস্ত্রের প্রাচীনতা তার গৌরবের বিষয় হতে পারে না।" (ওদুদ, ২০১৪ : ৯০)

কাজী আবদুল ওদুদ মনে করেন, হিন্দু-সংস্কৃতি, মুসলিম-সংস্কৃতি, আর্য-সংস্কৃতি, সেমেটিক-সংস্কৃতি বলে ভারতবর্ষে যে সব কথা উঠেছে তার মূলে কোনো কার্যকর সুচিন্তা নেই। কারণ সংস্কৃতি যদি হিন্দু ও মুসলমানের রাষ্ট্রিক ও সম্মিলিত জিনিস হয় তাহলে তাদের সাংস্কৃতিক জীবন ভিন্ন হতে পারে না। তবে যদি হিন্দু ও মুসলমানের রাষ্ট্রিক জীবন স্বতন্ত্র হয় তাহলে হিন্দু-সংস্কৃতি, মুসলিম-সংস্কৃতি এসব চিন্তা কিছু পরিমাণে কার্যকর হতেও পারে। কিন্তু যাঁরা হিন্দু-সংস্কৃতি, মুসলিম-সংস্কৃতি ইত্যাদি কথা যারা বলছেন তাঁরা ভারতবর্ষের অথবা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের হিন্দু ও মুসলমানের জন্য পৃথক রাষ্ট্রব্যবস্থার কথা তেমন ভাবছেন না (ওদুদ, ২০১৪ : ৮৯-৯০)। তাঁর মতে, হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত জীবন যদি এদেশে সম্ভবপর না হয়, তবে হিন্দু-সংস্কৃতি, মুসলমান-সংস্কৃতি, আর্য-সংস্কৃতি, সেমীয়-সংস্কৃতি এসব কথা দায়িত্বহীন হয়ে পড়ে এবং এসবের প্রচলন আমাদের ভাষায় ও সাহিত্যে যত কম হয় ততই মঙ্গল এবং ততই আমাদের চিন্তার সৌখিনতা ঘুচবে আর আমরা সত্যাশ্রয়ী হব। তিনি বলেছেন—

> সার্থক সমাজ-সত্তার দিক দিয়ে বাংলার মুসলমান অথবা হিন্দু বাংলার অথবা বিশাল ভারতবর্ষের অংশ ভিন্ন যখন আর কিছু নয়, তখন তার সাংস্কৃতিক জীবনের সার্থকতা লাভের পথ এই বিশাল সত্তার সঙ্গে তার গূঢ় যোগ উপলব্ধির ভিতর দিয়েই। ঝরণার সার্থকতা যেমন নদীর পুষ্টিসাধন করে'-এ সত্য যত অকপট ভাবে স্বীকার করা যাবে, ততই শক্তি ও শ্রী লাভের পথে আমরা অগ্রসর হব। (ওদুদ, ২০১৪ : ৯০)

কাজী আবদুল ওদুদ ভারতবর্ষের প্রাচীন সাধনা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। 'যত মত তত পথ' অথবা 'যত পথ তত মত' তত্ত্ব-সূত্রে ভারতের সমাজজীবনে কিছুটা শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলেও তিনি তাতে লক্ষ্য করেছেন সচেতনতার অভাব। উপনিবেশপূর্ব ভারতবর্ষ কমবেশি ঐক্যবদ্ধ

হয়েছিল চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য (শা. আ., খ্রি. পূ. ৩৪০-২৯৮), মুহম্মদ বিন তুঘলক (শা. আ. ১৩২৫-১৩৫১), আকবর (শা. আ. ১৫৬০-১৬০৫) ও আওরঙ্গজেবের (জ. ১৬১৮-মৃ. ১৭০৭) শাসনকালে। উপমহাদেশের সংস্কৃতির সাধারণ বৈশিষ্ট বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য অন্বেষণ। অনন্ত বৈচিত্র্যের ভিতরে একত্বের সন্ধান কেবল মানস বা মননগত ব্যাপার নয়, সামাজিক সত্য। বৈচিত্র্যের মাত্রাবোধ সুদৃঢ় করে একত্বকে। প্রাবন্ধিক আবদুল ওদুদ মনে করেন, ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক জীবনের সার্থকতা আসবে হিন্দু-মুসলমানের বিশাল সত্তার সঙ্গে গূঢ় যোগ ও পারস্পরিক শ্রেয় উপলব্ধির ভিতর দিয়েই। তাঁর মতে, বাংলার মুসলমানের সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে বৌদ্ধ, হিন্দু, পাঠান, আরব ইত্যাদি বিচিত্র উপাদানের সমন্বয়ে। এমন পরিস্থিতিতে আমাদেরকে অনন্ত বৈচিত্র্যের ভিতরে একত্বের সন্ধান করতে হবে। বৈচিত্র্য কম হোক বা বেশি হোক, তার ভিতরকার একত্ব হতে হবে সুদৃঢ়-সামাজিক অর্থে। ততটুকু বৈচিত্রকে আমাদের স্বীকার করতে হবে যতটুকু এই সুদৃঢ় একত্বের অনুকূল। অধিক বৈচিত্র্য ঐক্য নষ্ট করে, কারণ "ফলের প্রাচুর্যে ডাল যদি ভেঙে পড়ে, তবে তা ফল ও ডাল দুইয়েরই জন্য হয় অসার্থক।" (ওদুদ, ২০১৪ : ৯১)

কাজী আবদুল ওদুদ বলেছেন, সাত শতাব্দী পূর্বে বাংলায় যে মুসলমানের আগমন ঘটেছিল তাদের মধ্যে 'সম্ভ্রান্ত' ও 'সাধারণ' এই দুইটি শ্রেণি ছিল এবং শ্রেণি দুটির মাঝে দুটি ভিন্ন রকমের মনোভাব ছিল। যারা 'সম্ভ্রান্ত' তারা অনুবর্তী ছিল ইসলামী সংস্কৃতি বলতে যা বুঝায় তার, আর যারা 'সাধারণ' তাদের জীবন চলতো পূর্বপুরুষদের ধারায়। তখন দেশের সমস্ত সমাজের উপরেই প্রভাবশীল ছিল 'লীলা-বাদ'এর এবং সমাজস্থ মানুষগুলো সন্তুষ্ট ছিল তাদের ভাগ্য নিয়ে। এভাবে দীর্ঘকাল অতিক্রমের পরে বাংলার তথা ভারতের মানুষ লাভ করে ইউরোপের স্পর্শ। ফলস্বরূপ ভারতের হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে আত্ম-অন্বেষণ সক্রিয় হয় এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে অনেক মহিমময় ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে। (ওদুদ, ২০১৪ : ৯১)

কাজী আবদুল ওদুদ-এর মতে, ভারতবর্ষ চিন্তার দিক দিয়ে ইউরোপের চেয়ে অন্তত পঞ্চাশ বছর পেছনে পড়ে রয়েছে। ফলে উনিশ শতকে ইউরোপে সংস্কৃতি-চর্চার যে ঢেউ এসেছিল ভারতবর্ষে তার প্রভাব দেখা দেয় বিশ শতকে। ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি-চর্চার প্রথমদিকে ভদ্রলোক হওয়া বা একটি ভদ্র পরিবার গড়ে তোলাই ছিল আমাদের দেশের শিক্ষিতজনদের প্রধান লক্ষ্য। পরবর্তীতে দেশে গণতন্ত্রের-চর্চা ও সাম্প্রদায়িক-বিরোধ তীব্র হয়ে উঠলে আমাদের সাংস্কৃতিক চেতনায় সমাজ-বোধ একটা বড় জায়গা দখল করে নেয়। পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে এদেশের হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে আত্মান্বেষণ শুরু হলে দেশের বিভিন্ন স্থানে অনেক কীর্তিমান পুরুষের আবির্ভাব হয়। তাঁর মতে, ভারতবর্ষের একালের সাংস্কৃতিক চিন্তার ইতিহাসে বাংলার বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) ও পাঞ্জাবের আল্লামা ইকবাল (১৮৭৭-১৯৩৮) হলেন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি। কারণ এঁদের চিন্তায় সনাতন স্থিতিশীলতার সঙ্গে কিছুটা গতিশীলতা মিশেছে। আমাদের দেশের একালের সংস্কৃতি-চিন্তায় যে স্থিতিশীলতার ও গতিশীলতার এক অদ্ভুত মিশ্রণ ঘটেছে এটা সম্ভবপর হয়েছে এই দুই জনের প্রভাবে। এঁরা দুজনেই চেয়েছেন প্রাচীন ধর্মের নূতন ব্যাখ্যা দিতে এবং শক্তিশালী রাষ্ট্রীয়-জীবন গঠনে দেশবাসী উদ্বুদ্ধ করতে। তাঁর মতে—

> ভারতবর্ষের একালের সাংস্কৃতিক চিন্তার ইতিহাসে দুই জনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য- একজন বাংলার বঙ্কিমচন্দ্র অপরজন পাঞ্জাবের ইকবাল। [...] এঁরা দুজনেই চেয়েছেন প্রাচীন ধর্মের নূতন ব্যাখ্যা দিতে, সঙ্গে সঙ্গে শক্তিশালী রাষ্ট্রজীবন গঠন বলতে যা বোঝায় তারও স্পষ্ট ইঙ্গিত এঁদের বাণীতে রয়েছে। [...] বঙ্কিমচন্দ্র ও ইকবালের চিন্তায় সনাতন স্থিতিশীলতার সঙ্গে কিছু গতিশীলতা যে মিশেছে, এরই মধ্যে নিহিত রয়েছে তাঁদের জনপ্রিয়তার রহস্য।

> স্থিতিশীলতার আর গতিশীলতার এই যে অদ্ভুত মিশ্রণ আমাদের দেশের চিন্তায় ঘটেছে, আমাদের একালের সংস্কৃতিগত চিন্তায় এই একটি গোড়ার কথা। (ওদুদ, ২০১৪ : ৮৯)

আল্লামা ইকবালের আত্ম-তত্ত্ব বা আমিত্ব-তত্ত্ব'র মূল কথা ছিল প্রাচ্যের জড়তা, কর্মহীনতা ও নিস্পৃহতাকে বিসর্জন দিয়ে প্রাত্যহিক জীবনকে সুন্দরতর ও মহত্তর করা। কাজী আবদুল ওদুদ ছিলেন কবি ইকবালের এই চেতনার দৃঢ় সমর্থক। তবে ইকবালের আমিত্ব-সাধনার সামাজিক ও রাজনৈতিক ধারার ঐতিহাসিক ব্যাখ্যাকে তিনি যুগোপযোগী মনে করেননি। ইকবালের দৃষ্টিতে প্রাচীন ধর্ম ও সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন প্রত্যাশিত কিন্তু প্রাবন্ধিক কাজী আবদুল ওদুদ-এর কাছে তা অসম্ভব ব্যাপার। কারণ, সমস্ত ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ও মানবকল্যাণ-জিজ্ঞাসা ছিল মানুষের শ্রেষ্ঠ আত্মিক সম্পদ। পাশ্চাত্য-সংস্কৃতির অকুণ্ঠিত কল্যাণ-অন্বেষা কখনোই প্রাচ্যের আমিত্ব-সাধনের প্রতিদ্বন্দ্বী নয় বরং পরিপূরক। তিনি ইকবালের মহৎ-বেদনার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সমন্বয়ধর্মিতার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

অপরদিকে, উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের ও হিন্দু সম্প্রদায়ের আত্ম-উন্মোচনের কাণ্ডারি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি স্বীয় সম্প্রদায়ের জাগরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর অন্বিষ্ট হিন্দুত্বের আড়ম্বর চেতনা নয় বরং মানবতা। কাজী আবদুল ওদুদ মনে করেন, বঙ্কিমচন্দ্র নিজেকে হিন্দু-সমাজের উদ্ধারকর্তা হিসেবে মনে করলেও, তিনি আসলে তাঁর কালের জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিচর্যার মধ্যদিয়ে ভাবাবেগ ও অন্ধকারকেই দূর করতে চেয়েছেন। হিন্দু-সমাজের ক্রমশ উন্নতির জন্য তাঁর ভেতরে অস্বস্তির চিন্তাস্রোত কাজ করেছে। তার রচনায় সত্যকার রূপ সৃষ্টির চেয়ে idea বা চিন্তার সৌন্দর্যময় উপলব্ধিই অধিক মাত্রায় প্রকাশিত হয়েছে। স্বসম্প্রদায়ের কল্যাণচিন্তাতে বিভোর হয়ে তিনি ভাবনার সৌন্দর্যমূলক অংশকে পূর্ণাঙ্গ করেননি। জ্ঞান ও মনুষ্যত্বের পূজারি বনাম প্রবলভাবে হিন্দুত্বের প্রচারক – তাঁর ব্যক্তিত্বে সব সময় এই দ্বন্দ্বটি দেখা গেছে। স্থিতিশীলতা ও গতিশীলতার মিশ্রণে তাঁর ভাবনা, অজ্ঞতাপ্রসূত নিবিড় ভক্তি এবং উৎকট বিদ্বেষের সৃষ্টি করেছে।

কাজী আবদুল ওদুদ-মনে করেন, আমাদের সাংস্কৃতিক চিন্তার গভীর যোগ রয়েছে ইউরোপ-বিদ্বেষ বা ইউরোপ-ভীতির সঙ্গে। কারণ ইউরোপের ভাবুক-রূপের প্রতি যে ভারতীয়রা মুগ্ধ হয়েছিল পরবর্তীতে ইউরোপের প্রভু-রূপের সঙ্গে পরিচিত হতে তাদের আর দেরি হয়নি। ফলে ভারতের ইউরোপ-পূজা রূপান্তরিত হয় ইউরোপ-বিদ্বেষে বা ইউরোপ-ভীতিতে। এই ইউরোপ-বিদ্বেষ এর সঙ্গে রয়েছে এদেশের একালের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চেতনার গভীর সম্বন্ধ। (ওদুদ, ২০১৪ : ৯১)

কাজী আবদুল ওদুদ-এর মতে, আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ সাংস্কৃতিক চেতনা বলতে বুঝেন কূর্ম-বৃত্তি অবলম্বনকে। বিপন্ন কূর্মের মতো অক্ষম আক্রোশ তাদের এই চেষ্টার আনুষঙ্গিক। তাঁর দৃষ্টিতে, বাংলার মুসলমানের সংস্কৃতি নানা দৈন্যে জর্জরিত। এই দৈন্য যতোটা না আর্থিক তার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে ভাবের ও সংকল্পের। বাংলার মুসলমানরা মুসলমান হিসেবে প্রতিমা পূজায় আপত্তি জানিয়ে প্রাকৃত জীবন অনেকখানি অস্বীকার করেছে। কিন্তু তাদের উচিত ছিল সজাগ-মানব-জীবন অর্থাৎ জ্ঞান ও প্রেমের জীবনকে স্বীকার করা—যেটা তারা করতে পারেনি। তাঁর ভাষায়—

> [...] নানা দৈন্যে বাংলার মুসলমান জর্জরিত, আর্থিক দৈন্য তার যত তার চেয়ে অনেক বড় তার ভাবের দৈন্য, সঙ্কল্পের দৈন্য। মুসলমান হিসেবে প্রতিমা পূজায় আপত্তি জানিয়ে সে প্রাকৃত জীবন অনেকখানি অস্বীকার করেছে; কিন্তু জীবনে বড় কথা 'অস্বীকার করা' নয় বরং বড় কথা হচ্ছে

> 'স্বীকার করা'—মুসলমানের স্বীকার করা উচিত ছিল সজাগ-মানব-জীবন অর্থাৎ জ্ঞান ও প্রেমের জীবন-ইসলামের অর্থ কেবল তাই হতে পারে। কিন্তু তেমন করে স্বীকার সে কিছুই করতে পারেনি—যা স্বীকার করেছে অথবা করতে চেয়েছে তা তুচ্ছ আচার-পূজা ভিন্ন আর কিছু নয়। (ওদুদ, ২০১৪ : ৯২)

–এই অবস্থ থেকে উত্তরণের জন্য বাঙালি মুসলমানের উচিত 'ভাবাত্মক মনোভাব ও জাগ্রত আদর্শ'কে অবলম্বন এবং জ্ঞান ও প্রেমের জীবন স্বীকার করা

কাজী আবদুল ওদুদ মনে করেন, সংস্কৃতিতে সংস্কৃতিতে বিরোধের কথা না ভেবে আমাদের উচিত সে-সবের প্রাণশক্তির সন্ধান করা যা থেকে সম্ভবপর হবে জাতিতে-জাতিতে ও সমাজে-সমাজে গাঢ়তর সহযোগিতা ও মঙ্গলতর ভবিষ্যৎ। মানুষের বিচিত্র সংস্কৃতির এই প্রাণশক্তি বর্তমানে চিন্তাক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিকতা ও মানবহিত আর কর্মক্ষেত্রে সুব্যবস্থিত রাষ্ট্র-জীবন নামে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন, একালে বাংলার মুসলমানের সাংস্কৃতিক জীবনও প্রতিষ্ঠিত হবে, সেই বৈজ্ঞানিকতা, মানবহিত ও সুব্যবস্থিত রাষ্ট্রের ভিত্তির উপরেই।

অসার্থক সংস্কৃতি-চিন্তার স্তর থেকে সার্থক সংস্কৃতি-চিন্তার স্তরে উপনীত হওয়ার জন্য কাজী আবদুল ওদুদ কয়েকটি ধাপের কথা বলেছেন। সেগুলো হল :

> ক. দেশে অভুক্ত ও কর্মহীন কেউ থাকবে না।
> খ. একান্ত বীভৎস না হলে কোনো সমাজেরই ধর্মাচার অশ্রদ্ধের বিবেচিত হবে না; প্রাচীন বলেই কোনো কিছু বরণীয় হবে না, বরণীয় তার বর্তমান কার্যকারিতার জন্যে।
> গ. হিন্দু-মুসলমানের পোষাক ও নামের ব্যবধান থাকবে না।
> ঘ. সামাজিক আদান-প্রদান, বিবাহ-সাদি সমেত-সর্বত্র সহজ হবে।
> ঙ. আইন সমস্ত দেশের জন্য এক হবে। (ওদুদ, ২০১৪ : ৯৩-৯৪)

কাজী আবদুল ওদুদ মনে করেন, শিক্ষিত সমাজে সংস্কৃতির প্রগাঢ় প্রভাব থাকে। ধর্মের মতো বর্তমানকালে সংস্কৃতির মূলকাজ হলো সমাজের উৎকর্ষ সাধন করা। তাঁর কাছে সংস্কৃতি হলো অতীতের শ্রেষ্ঠ ভাব-সম্পদের সমাহার। বিশ্বের সমন্বিত জ্ঞান ও কল্যাণ-অন্বেষা সংস্কৃতির অন্তর্গত। তিনি জীবনচর্চায় প্রগতিশীল; চিন্তাচর্চা, জ্ঞানের সমন্বয় ও সংস্কৃতি জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে বিবেচনাশীল। তিনি প্রাচীন ঐতিহ্য বিবেচনার মাধ্যমে গ্রহণ করার পক্ষপাতী। ঐতিহ্যের সঙ্গে মানবকল্যাণ সংযুক্ত। যুগসংক্রান্তির এবং সমাজকল্যাণের প্রগতিতে ঐতিহ্যকে পুনর্মূল্যায়ন করতে হয়। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রাচীন চিন্তাকে তিনি যুগোপযোগী করতে প্রয়াসী। পুরনো ঐতিহ্য কালোপযোগী না হলে তিনি তাকে অচল ও অগৌরবের বলে চিহ্নিত করেন। তাঁর মতে, দ্বিধান্বিত ব্যক্তি সংস্কৃতিমনস্ক হতে পারে না। সংস্কৃতিবান-ব্যক্তিকে কালের প্রয়োজনে নূতন নূতন চিন্তাভাবনাকে গ্রহণ করার মতো মানসিকতা থাকতে হয়। স্বাধীন স্বায়ত্তশাসিত মনোভূমি থেকে উৎসারিত জিজ্ঞাসাকাতর ও সত্যাশ্রয়ী ব্যক্তিই সুন্দরের সাধনা করতে পারেন।

ধর্মাচার এবং ধর্মবুদ্ধি মানবাবেগের সাথে সম্পর্কিত। দীর্ঘকাল ধরে ভারতবর্ষে হিন্দুর মুসলিম-বিদ্বেষ এবং মুসলমানের হিন্দু-বিদ্বেষের বহু রক্তক্ষয়ী দৃষ্টান্ত আছে। কাজী আবদুল ওদুদ উপমহাদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতায় উপলব্ধি করেছেন, হিন্দু-মুসলমানের অতীত সুখকর ও স্বস্তিদায়ক না হলেও বর্তমান কালের প্রয়োজনে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যর সংস্কৃতি হতে হবে স্বতঃস্ফূর্ত। তাঁর প্রত্যাশা ছিল স্বাধীন দেশে 'হিন্দুর মুসলিম-বিদ্বেষ আর মুসলমানের হিন্দু-বিদ্বেষ' কেবলই নিন্দনীয় নয় বরং দণ্ডনীয় বলেও বিবেচিত হবে। সংস্কৃতির মূল উদ্দেশ্য যেখানে মনুষ্যত্বের বিকাশ সেখানে ধর্মবুদ্ধি মানুষের চিন্তা স্রোতকে সংকীর্ণ করে তোলে। জাতীয় জীবনের মঙ্গল সম্পর্কে সংস্কৃতি মানুষকে সচেতন করে তোলে। উদার মানবিকতার

বোধই মনুষ্যত্ব বিকাশের উপযুক্ত। ধর্মাচার এবং ব্যক্তিত্বের সংক্ষিপ্ত ও সংকীর্ণ পরিমণ্ডল সংস্কৃতির উদার-আকাশকে দ্বিধান্বিত ও বিপন্ন করে তোলে। সংস্কৃতিকর্মীর কল্যাণের ব্রত স্পন্দমান, বেগবান, ধাবমান হওয়া প্রয়োজন। সংস্কৃতিবান ব্যক্তির বিকৃত-বুদ্ধি আত্ম-অহমিকার জন্ম দেয়, যা প্রশ্রয় দেয় ও লালন করে উগ্র জাতীয়তাবাদকে। সংস্কৃতির উদার উন্মুক্ত-প্রান্তরে সম্মিলিত জীবনের ভিত্তিতে সংস্কৃতিকর্মীর দেশ ও জাতি গঠনে নিয়োজিত থাকা উচিত। সংস্কৃতিকর্মীর বুদ্ধিহীন অন্ধ-আবেগ প্রগতির শত্রু। সংস্কৃতির আবেদন চিরন্তন। সংকীর্ণতা পরিহার করে উদার মানবিকতার পথেই সংস্কৃতির অগ্রযাত্রা। প্রাবন্ধিকের প্রত্যাশা, ভারতের ঐক্য ও সমৃদ্ধির সংস্কৃতি, সমাজে জ্ঞান অন্বেষণ, কল্যাণ আহরণ ও বিতরণ এবং ঔদার্যের আলো বিকিরণ করবে।

চার. উপসংহার

কাজী আবদুল ওদুদের সংস্কৃতি-চেতনা মূলত সৃষ্টিধর্মী। কর্ম ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে সৃষ্টিপ্রবণতাই তাঁর সংস্কৃতি চিন্তার মূল বৈশিষ্ট্য। সংস্কৃতি-ক্ষেত্রে সমন্বয়বাদিতা, সৌন্দর্যবোধ, সৃষ্টিশীলতা, শ্রেণিহীনতা ও সামাজিক-উৎকর্ষর প্রতি তাঁর প্রবল আস্থা। সংস্কৃতিতে তিনি ধর্মীয়-সম্মোহন ও রাজনৈতিক-তিক্ততা মুক্ত অন্তর্নিহিত সৃষ্টিধর্ম ও মনুষ্যত্বের সন্ধান করেছেন। সংস্কৃতি বিকাশধর্মী না হলে কোনও ভাবেই তার দ্বারা দেশের মনোজীবন ও সমাজজীবনের নব নব সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয় না। বিকাশধর্মের জন্য সদাজাগ্রত-মানবচিত্তের প্রয়োজন। তাই ভারতীয় সংস্কৃতির রূপ-রেখা নির্দেশের প্রশ্নে তিনি চিন্তাশ্রয়ী ও সংবেদনশীল। সংস্কৃতির সংমিশ্রণের ক্ষেত্রে কেবল ভারত-ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায় থেকে কিছু উপাদান গ্রহণকে তিনি প্রচ্ছন্ন জাত্যাভিমান বলে মনে করেন। অভিমান ও সৃষ্টিধর্ম পরস্পরের পরিপূরক নয় বরং প্রতিদ্বন্দ্বী। ভারতীয় সংস্কৃতি-চিন্তার ক্ষেত্রে তিনি সৃষ্টিশীলতার সঙ্গে বিনয় ও সত্যানুসন্ধিৎসার একান্ত সংযোগ কামনা করেছেন। তিনি মনে করেন, কোনো রকমের প্রলোভন কিংবা সম্মোহন নয়, একমাত্র সত্যাশ্রয় হলো সৃষ্টিশীল ও সংস্কৃতিবান কর্মীদের প্রধান অবলম্বন। সংস্কৃতিবান মানুষকে রূপান্তরশীল এবং বিকাশধর্মী হতে হবে। সংস্কৃতি বিবেচনায় তিনি সংবেদনশীল ও বুদ্ধিদীপ্ত। জাতীয়-জীবনে সংস্কৃতির তাৎপর্য অনুসন্ধানকল্পে তিনি মনোজীবন, ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবনের উজ্জীবন প্রত্যাশা করেছেন। কারণ, সংস্কৃতি মানুষকে দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলে; ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনের বিকাশের সম্ভাবনাকে ত্বরান্বিত করে।

সহায়কপঞ্জি

অন্নদাশঙ্কর রায় (১৪১৮)। *প্রবন্ধসমগ্র* (৮ম খণ্ড)। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা।

অমলেশ ত্রিপাঠী (১৪২৩)। *স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস*। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

আনিসুজ্জামান (২০০১)। *মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য*। প্যাপিরাস, ঢাকা।

আবদুস সাত্তার ও আশিস কুমার দে (সম্পা., ২০১৪)। *চেনা তরবারি কাজী আবদুল ওদুদ*। দীপ প্রকাশন, কলকাতা।

আবুল কাসেম ফজলুল হক (২০১১)। *বাংলাদেশের প্রবন্ধ সাহিত্য*। জাগৃতি প্রকাশনী, ঢাকা।

——— (২০১৬)। *বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন ও উত্তরকাল*। জাগৃতি প্রকাশনী, ঢাকা।

——— (২০১৫)। *উনিশ শতকের মধ্য শ্রেণি ও বাংলা সাহিত্য*। জাগৃতি প্রকাশনী, ঢাকা।

——— (২০০২)। *সংস্কৃতির সহজ কথা*। অ্যাডর্ন পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

——— (২০০২)। *সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রসঙ্গে*। গ্লোব লাইব্রেরী (প্রাঃ) লি., ঢাকা।

আবুল কাসেম ফজলুল হক ও ড. মিজান রহমান (সম্পা., ২০১০)। *বাঙালির সংস্কৃতিচিন্তা*। কথাপ্রকাশ, ঢাকা।

ইউভাল নোয়া হারিরি (মোস্তাক আহমেদ সম্পা., ২০১৮)। *সেপিয়েন্স মানুষের ইতিহাস*। (ভূমিকা : মুহম্মদ জাফর ইকবাল; ভাষান্তর : সুফিয়ান লতিফ, শুভ্র সরকার, রাগিব আহসান) নট ফর সেল ক্লাব, কালেক্টর'স এডিশন, ঢাকা।
এম. মতিউর রহমান (২০১৩)। *বাঙালির দর্শন : মানুষ ও সমাজ (উনিশ শতক)*। অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা।
কাজী আবদুল ওদুদ (২০১৪)। *শাশ্বত বঙ্গ*। হাওলাদার প্রকাশনী, ঢাকা।
কামরুদ্দীন আহমদ (২০১৪)। *পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতি*। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।
——— (২০১৮)। *বাংলার এক মধ্যবিত্তের আত্মকাহিনী*। প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।
খোন্দকার সিরাজুল হক (২০০৬)। *মুসলিম সাহিত্য-সমাজ : সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম*। কথাপ্রকাশ, ঢাকা।
——— (২০১৩)। *কাজী আবদুল ওদুদ*। সুচয়নী পাবলিশার্স, ঢাকা।
গোলাম মুরশিদ (১০১৬)। *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*। অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা।
জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী (সম্পা., ২০১১)। *বাংলা প্রবন্ধ পরিচয়*। অ্যাডর্ন পাবলিকেশন্স, ঢাকা।
নিত্যগোপাল বর্মণ (২০১৫)। *ঐতিহ্য : ধর্মচিন্তা ও বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য*। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা।
নির্মল কুমার বর্মণ (২০১৫)। *বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের প্রেক্ষিত*। গ্রন্থ বিকাশ, কলকাতা।
নুরুল আমিন (২০০৮)। *ওদুদ-রচনা ও বাঙালি সমাজ*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
বিপ্লব চক্রবর্তী (২০১০)। *বাংলা প্রবন্ধ বীক্ষা সৃষ্টি ও স্রষ্টা*। অক্ষর প্রকাশন, কলকাতা।
বিশ্বজিৎ ঘোষ (২০০৯)। *বাংলাদেশের সাহিত্য*। আজকাল প্রকাশনী, ঢাকা।
——— (২০১৮)। *রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ও উত্তরকাল*। অনন্যা, ঢাকা।
মমতাজ বেগম (২০১৪)। *নবজাগরণের অগ্রদূত কাজী আবদুল ওদুদ*। প্রগ্রেসিভ পাবলিকেশন্স, কলকাতা।
মুহম্মদ সাইফুল আলম (২০১৮)। *কাজী আবদুল ওদুদ*। কথাপ্রকাশ, ঢাকা।
মোস্তাক আহমদ দীন (২০১৭)। *কাজী আবদুল ওদুদের মননবিশ্ব*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
রহমান হাবিব (২০০৭)। *বিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তিক দর্শন*। জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।
সাইফুল আলম (২০১৪)। *কাজী আবদুল ওদুদ : জীবনদর্শন ও সাহিত্যসাধনা*। কথাপ্রকাশ, ঢাকা।
সাঈদ-উর-রহমান সম্পা. (১৯৮২)। *ওদুদ-চর্চা*। কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা।
——— (২০০১)। *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা।